আইনের শাসনঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, নির্বাহী সদস্য, 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'

জি. এম. ট্রেভেলিয়ান. ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিকদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত, তাঁর 'ইংল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, 'ল' শব্দটি তার অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রতিদ্বন্দ্বী 'ডুম' এবং ল্যাটিন প্রতিদ্বন্দ্বী 'ল্যাক্স'-কে পরাজিত করে ইংল্যান্ডের বুকে জায়গা করে নিয়েছিল, যে শব্দটি ছিল ড্যানিশ। এই 'ল'-কেই আমরা আইন বলে জানি।

আইনের শাসন বা 'রুল অব ল' প্রতিষ্ঠা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় জাতির জন্য অন্যতম অঙ্গীকার। যেমন, অঙ্গীকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে আমাদের সংবিধানই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন। তারই প্রস্তাবনায় আমাদের অঙ্গীকার এই যে, আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে, সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবেত্তা, 'গ্রে' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ– 'নেচার অ্যান্ড সোর্সেস অব ল'-তে বলেছেন, 'আইন হচ্ছে তাই যা বিচারকরা আইন বলে ঘোষণা দেবেন (Law is what the judges declare)। তাই আইনের শাসন বলতে আমরা বুঝব, যা আমাদের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে ঘোষণাবলে ঘোষণা করেন। অনুচ্ছেদ ১১১ বলছে, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন সকল অধস্তন আদালত এবং আপিল বিভাগ থেকে ঘোষিত আইনের সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়। আইনের শাসন বা 'রুল অব ল' সম্পর্কে মাজদার হোসেন মামলায় এবং ইদ্রিসুর রহমান মামলায় বিস্তারিত ব্যাখা দেয়া আছে। ইদ্রিসুর রহমান মামলায় – যা 'জাজেস কেইস' নামে পরিচিত – আমাদের সর্বোচ্চ আদালত ঘোষণা করেছেন, ''The most important meaning of the rule of law is that the disputes as to the legality of the acts of the government are to be decided by the judges who are independent of the executive.'' (১৫ বিএলসি (এডি) ৪৯)। অর্থাৎ আইনের শাসনের মূল অর্থ হলো, সরকারের কাজকর্ম আইনসম্মত কি-না তা নির্ধারণ করবেন বিচারকেরাই। তবে শর্ত এই যে, সে বিচারকরা নির্বাহী বিভাগ থেকে হবেন স্বাধীন।

'আইনের শাসন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' আলোচনার পূর্বে আইনের শাসনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে।

গ্রিসের নগর-রাষ্ট্র, নাম থিবিস। সময়টা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। রাজা ক্রিয়ন আদেশ দিলেন যে, দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শাস্তি হিসেবে নিহত পলিনিসিসকে কবর দেয়া যাবে না। পলিনিসিসের বোন এন্টিগন এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করে ভাইকে কবর দিলেন। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নির্ভিক এন্টিগন জবাব দিলেন, মৃত ভাইকে কবর দিয়ে আমি চিরন্তন বা শাশ্বত আইনের বিধান পালন করেছি, যার সঙ্গে রাজার আদেশ সাংঘর্ষিক। সফক্লিস বিশ্ববাসীকে এন্টিগনের মাধ্যমে আইনের শাসনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাই বিশ্ববাসী গ্রহণ করেছে। শাসকের আইন যখন শাশ্বত আইনের পরিপন্থী হয়, তখন শাসকের আইন আইনের মর্যাদা হারায়। শাসকের আইন তখন আইনই নয়, তাই অন্যায় আদেশের শাসন মানুষ মানতে বাধ্য নয়। সফক্লিসের শত বছর পরে, প্লেটো এবং এরিস্টোটল আইনের শাসনের এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করলেন যে, ব্যক্তির শাসন নয়, বরং আইনের শাসনই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

১৬১২ সাল, ১০ নভেম্বর, এক রবিবারের সকালে রাজা জেমস ইংল্যান্ডের সকল বিচারককে ডাকলেন। রাজা জানতে চাইলেন, তিনি নিজে কেন বিচার করতে পারবেন না, যেহেতু তাঁর কাণ্ডজ্ঞান এবং বিচার-বুদ্ধি, বিচারকদের চাইতে কিছুতেই কম নয়। বিচারকদের পক্ষে জবাব দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি স্যার অ্যাডওয়ার্ড কোক নির্ভিকভাবে বললেন, যা তাঁর শতবৎসর পূর্বে ব্র্যাক্টন বলে গিয়েছিলেন– রাজা বিচার করতে পারেন না, কারণ রাজা স্রষ্টা ও আইনের অধীন, রাজা আইনেরই সৃষ্টি। এই উত্তরে ক্ষিপ্ত হলেন রাজা। প্রধান বিচারপতি চাকরি হারালেন বটে, কিন্তু তাঁরই কল্যাণে ইংল্যান্ডবাসী পেল 'পিটিশন অব রাইটস' এবং 'বিল অব রাইটস' এবং চিরদিনের জন্য ইংল্যান্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

যুক্তরাষ্ট্রে যখন নির্যাতনের অস্ত্র হিসেবে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট চালু হলো, মার্কিনিরা এর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করল, তাই তার স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা। শাসকের আইন তারা প্রত্যাখ্যান করল এই জন্য যে, সে আইন রচনায় তাদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না এবং জনগণের ইচ্ছার বিপরীতে কোনো আইনই আইন হতে পারে না। অর্থাৎ শাসকের আইন প্রত্যাখ্যাত হলো, স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, যার প্রতিফলন আমরা দেখি তাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় এবং সংবিধানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো, বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১৯৪৮ সনে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা বা ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস রচিত হলো, যার প্রস্তাবনায় বলা হচ্ছে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে অঙ্গীকার করতে হবে যে, তাদের নিজ দেশে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করবে।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই আমাদের সংবিধানে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি।

আজ জাতির জিজ্ঞাসা, আমরা কি আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পালন করতে সক্ষম হয়েছি? নির্বাচনকেন্দ্রিক গণতন্ত্র বা অনুমতির গণতন্ত্র, অসীম ক্ষমতাধর নির্বাহী বিভাগ, ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে অকার্যকর আইনসভা এবং আপিল বিভাগের একটি রায়কে কেন্দ্র করে নির্বাহী বিভাগের তাণ্ডবে প্রকম্পিত বিচার বিভাগ কি প্রমাণ করে না যে, আমরা সে অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়েছি? ১১১ অনুচ্ছেদের ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও কুদরত-এ-এলাহী পনির মামলার রায় আজও অবহেলিত। মাজদার হোসেন মামলার নির্দেশনাগুলো এখনও অপ্রতিপালিত। ইদ্রিসুর রহমানের রায়ের নির্দেশনাবলি উপেক্ষা এবং সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের উপেক্ষা ও অবহেলা এবং সামরিক সরকারের সৃষ্ট ১১৬এ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ১৯৭২ এর সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদকে পুনঃস্থাপিত না করা কি প্রমাণ করে না যে, আমরা আইনের শাসন নয়, বরং শাসকের আইনের মধ্যেই বসবাস করছি?

আজ নাগরিক সমাজ তথা সমগ্র জাতির একান্ত কর্তব্য সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম তার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। অন্যথায় আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে বাধ্য।

প্রবন্ধটি ০৩ এপ্রিল ২০১৮, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত।